TOPIC-LORD CURZON'S POLICY

SEM-3(HONS)

HMV, PAPER-EDCA CC 5, UNIT-3

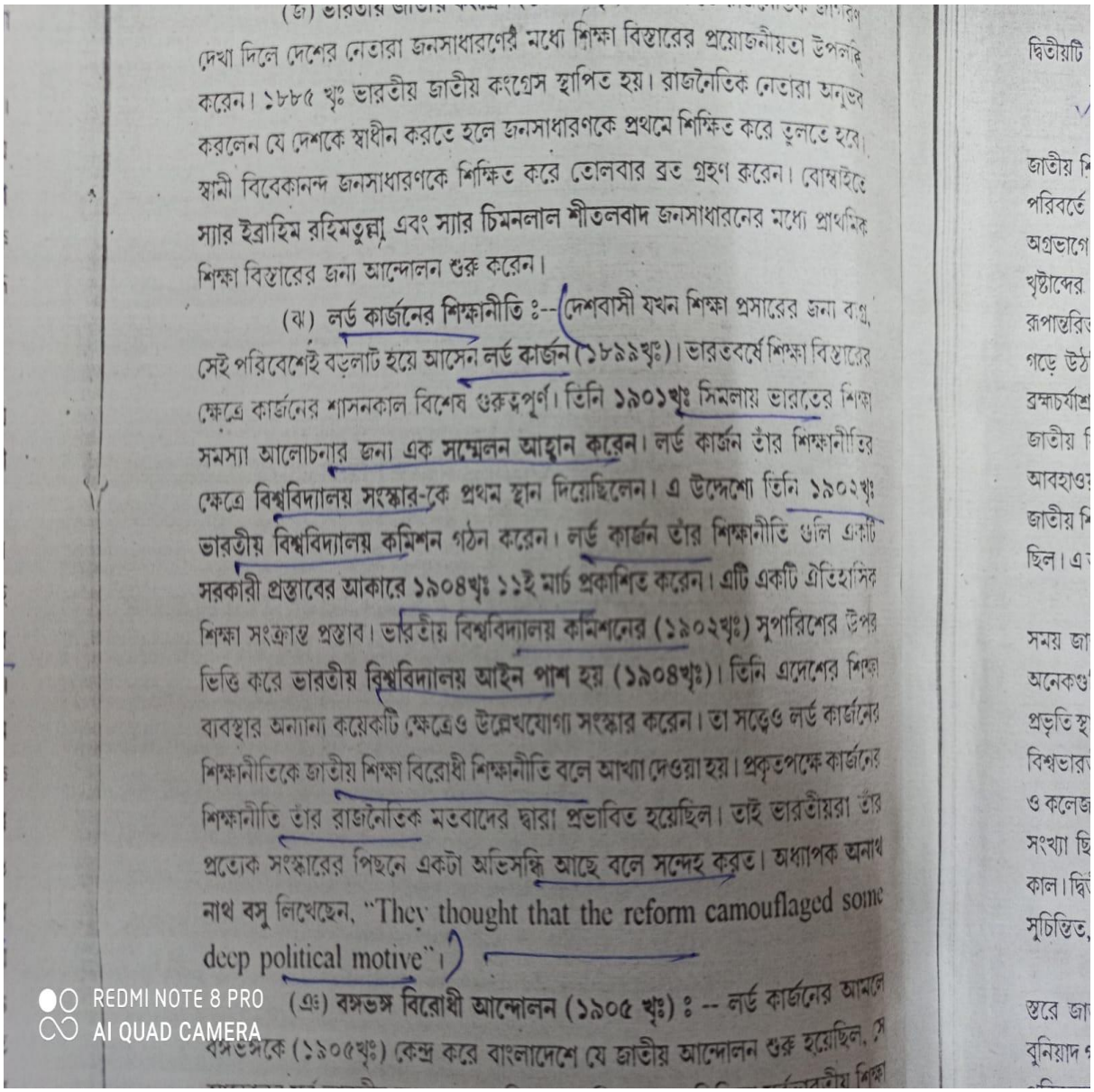

দেখা দিলে দেশের নেতারা জনসাধারণেরই মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮৮৫ খৃঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক নেতারা অনুভব করলেন যে দেশকে স্বাধীন করতে হলে জনসাধারণকে প্রথমে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলবার ব্রত গ্রহণ করেন। বোম্বাইতে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা এবং স্যার চিমনলাল শীতলবাদ জনসাধারনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

(ঝ) লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ঃ-- দেশবাসী যখন শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যগ্র, সেই পরিবেশেই বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড কার্জন (১৮৯৯খৃঃ)। ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কার্জনের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ১৯০১খৃঃ সিমলায় ভারতের শিক্ষা সমস্যা আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন। লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার-কে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০২খৃঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন। লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতি গুলি একটি সরকারী প্রস্তাবের আকারে ১৯০৪খৃঃ ১১ই মার্চ প্রকাশিত করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯০২খৃঃ) সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয় (১৯০৪খৃঃ)। তিনি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেন। তা সত্ত্বেও লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতিকে জাতীয় শিক্ষা বিরোধী শিক্ষানীতি বলে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে কার্জনের শিক্ষানীতি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই ভারতীয়রা তাঁর প্রত্যেক সংস্কারের পিছনে একটা অভিসন্ধি আছে বলে সন্দেহ করত। অধ্যাপক অনাথ নাথ বসু লিখেছেন, "They thought that the reform camouflaged some deep political motive"।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

(ঞ) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫ খৃঃ) ঃ -- লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫খৃঃ) কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সে

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা চেতনার নতুন দিগন্ত—জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা যুগপৎ কাজ করেছিল। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে ঐ শিক্ষার অসারতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিই এই বিক্ষোভের অন্যতম কারণ।

মিশনারীরা এই সময়ে ইন্দোর কলেজ, শিয়ালকোটের মূর কলেজ, কানপুরের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ, রাওয়ালপিণ্ডির গর্ডন কলেজ প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেও সাধারণভাবে তাঁরা হেরে গিয়েছেন। তাঁদের বদলে আর এক ধরনের আদর্শবাদীরা কর্মক্ষেত্রে এসেছেন। তিলকের নেতৃত্বে পুনার ফার্গুসন কলেজ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপন কলেজ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, লাহোরে আর্য সমাজের দয়ানন্দ এ্যাংলো-বেদিক কলেজ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, এ্যানি বেসান্তের কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কলেজও পূর্ণতা লাভ করে। এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতারা এক বিশেষ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজে নামেন।

এইসব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বহু স্কুল ও কলেজ এ-যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত 'বেসরকারী ভারতীয় উদ্যোগের অধিকার' এবং 'উদার সাহায্য' নীতি এই গতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কলেজ ও স্কুলকে স্বীকৃতি দানের যন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু পাঠ্যক্রমে নতুনত্ব আসে না। পরীক্ষাসর্বস্ব একমুখী শিক্ষা প্রসারের ফলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটে। উপরন্তু চাকরির বাজারে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা দেখা দিতে থাকে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউনই বলেন যে, স্কুল কলেজে প্রচলিত হারে যুবকরা শিক্ষা পেতে থাকলে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা প্রতি বছর চাকরির সংখ্যাকে অতিক্রম করবে। অর্থাৎ ঐ হারে শিক্ষার প্রসার ঘটলে বেকারত্ব আসবে।

কার্জন যুগ : সরকার যখন শিক্ষার দ্রুত প্রসার তথা চাকরির সংস্থানের অক্ষমতায় ভীত, অথচ দেশবাসী যখন শিক্ষাপ্রসারের জন্য ব্যগ্র, সেই পরিবেশেই বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড কার্জন। তিনি প্রশাসনের সকল দিকের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি অচিরেই হাত দিলেন।

লর্ড কার্জন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সিমলাতে এক শিক্ষা সম্মেলন বসালেন। সম্মেলনের সমীক্ষায় বলা হল শিক্ষার তৎকালীন প্রসার হয়েছে অসম এবং মাথাভারী। মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা বাড়লেও ভারতের শতকরা ৮০টি গ্রামে কোন স্কুল নেই, তিন-চতুর্থাংশ বালকের শিক্ষার সুযোগ নেই এবং শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র মেয়ে স্কুলে পড়বার মত সৌভাগ্যবতী। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশীয় ভাষাগুলি অবহেলিত। কিন্তু ইংরাজীর মানও নিম্নগামী। শিক্ষার লক্ষ্য হল চাকরি এবং তার ফলে পরীক্ষার অতি-প্রাধান্য। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা [illegible] হয়েছে। পাঁচমিশেলী সিনেট এবং এ্যাডহক সিণ্ডিকেটের ফলে

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও জরাজীর্ণ। অনুমোদিত কলেজগুলি শুধু কোচিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চতম স্তরে শিক্ষা দেওয়া এবং গবেষণার উদ্যম নেই। এই গড্ডালিকার মধ্যে ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা নেই। রাজনৈতিক উগ্রতার আবহাওয়া বিদ্যালয়ের অন্দরে প্রবেশ করেছে।

বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য লর্ড কার্জন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। কমিশন আর নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বলেন। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এক্তিয়ার পুনর্নির্ণয়ের কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-এর মধ্যে নির্দিষ্ট করা এবং দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য আইনসিদ্ধ সিণ্ডিকেট গঠনের সুপারিশ করা হয়। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন 'বোর্ড অফ স্টাডি' গঠনের কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনারও সুপারিশ করা হয়। কলেজীয় শিক্ষা সম্বন্ধেও কমিশন বিস্তৃত সুপারিশ করেন। প্রধান সুপারিশই হয় অনুমোদনের কড়াকড়ি। অনুমোদনের জন্য কলেজগুলিকে উপযুক্ত বাড়ি, সুযোগ্য অধ্যাপক, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, সুগঠিত লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও হোস্টেল রাখতে হবে। ছাত্রদের জীবন ও কাজের উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখতে হবে। কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। ইংরাজী শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রমে উন্নতি এবং পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধেও কমিশন মন্তব্য করেন। মেধাবী ছাত্র ছাড়া কারও পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার খর্ব করার জন্য কঠিনতর প্রবেশিকা পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়।

মোটের উপর কমিশনের বক্তব্য হল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ (second grade college) আদৌ থাকবে না। অনুমোদিত কলেজ মারফত ছাড়া (প্রাইভেট) পরীক্ষা দেওয়া চলবে না। মেধাবী শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে অনুমোদিত কলেজগুলিতে ছাত্র বেতন কমাতে হবে। কিন্তু অনুমোদিত কলেজগুলি যথেষ্ট সরকারী সাহায্য পাবে। শিক্ষার এই মানোন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ই হবে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষণ ও গবেষণার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়োজিত হবেন লেকচারার ও অধ্যাপক। Extension Lecture-ও হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনঃ কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার স্থির করে দেওয়া হয় এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃসংগঠিত হয়। কমিশনের সুপারিশগুলির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। আইনসিদ্ধ সিণ্ডিকেট, নতুন সিনেট এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থা গঠিত হয়। স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কলেজের অনুমোদন সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। প্রতিদানে লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

সাধারণ উচ্চ শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বহু বিষয়েও কার্জন হস্তক্ষেপ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠেরও উন্নতি করা হয়। পশুপালন, বন সংরক্ষণ এবং কৃষি শিক্ষার সূচনা হয়। কৃষি-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া চারুকলা মহাবিদ্যালয়, বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানবিসি ব্যবস্থা, উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তি, প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধ সংরক্ষণ প্রভৃতিও কার্জনের উদ্যমের চিহ্ন। নারী শিক্ষার জন্যও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে শিক্ষায় সরকারী মনোযোগ এবং উদার অর্থ সাহায্যের নীতি তিনি গ্রহণ করেন। বেসরকারী কলেজগুলির জন্য সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয়। কারিগরি শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক বরাদ্দের ব্যবস্থা হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে শিক্ষা অধিকর্তা (Director General) নিয়োগের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ প্রকাশ পায়। কার্জনের এই উদ্যমের ফলেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের কাউন্সিলে শিক্ষা বিভাগের জন্য সদস্য পদ সৃষ্টি করা হয়। ভারতে আধুনিক উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সূচনা হয় এই আমলে। তবুও গুণগত উন্নতির বিনিময়ে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতি জাতীয়তাবাদী ভারত মেনে নিতে পারেনি।

উচ্চ শিক্ষায় হস্তক্ষেপের অবধারিত ফল হিসাবে লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষায়ও হস্তক্ষেপ করেন। অস্বীকার করা যায় না যে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সময় বহু নিম্নমানের বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কার্জন এই দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। একদিকে তিনি বললেন মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষা পড়ার কথা, ইংরাজী শিক্ষার উন্নতি এবং Direct Method গ্রহণের কথা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও উন্নত শিক্ষক-শিক্ষণের কথা, পাঠ্যক্রমে বহুমুখীনতা এবং স্কুল ফাইনাল অথবা School Leaving Certificate পরীক্ষার জন্য আরও ব্যাপকভাবে 'বি কোর্স' প্রবর্তনের কথা। অপরদিকে 'নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নতি'র নীতিতে তিনি নিম্নমানের বিদ্যালয়গুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেন। তাই সাহায্যহীন বিদ্যালয়কে অনুমোদন দানের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্কুল অনুমোদনের ব্যাপারে কড়াকড়ি এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার কঠোরতা অবলম্বন করতে বলা হল। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা বাড়ল। এতেও সন্তুষ্ট না থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াও সাহায্যলাভের জন্য স্কুলকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের স্বীকৃতি গ্রহণের নীতি প্রবর্তিত হল। সরকারী স্বীকৃতির নিয়মে কড়াকড়ি এবং পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হল। নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে অনুমোদিত বিদ্যালয়কে সাহায্যের পরিমাণ বাড়ল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর অধিকার পেল কেবল অনুমোদিত স্কুলগুলি। এইসব স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই সরকারী বৃত্তি সীমাবদ্ধ করা হল। মাধ্যমিক শিক্ষায় কার্জন এই নীতি ঘোষণা করলেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি সরকারী প্রস্তাব আকারে।

প্রাথমিক স্তরে কিন্তু কার্জনের সংকোচন নীতির ব্যতিক্রম ঘটল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পরেও প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি, এই উল্লেখ করে তিনি ঘোষণা করলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার সক্রিয় প্রসার ঘটানো রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। প্রাদেশিক রাজস্ব এবং জেলা-বোর্ডের তহবিলেও প্রাথমিক শিক্ষার দাবি সর্বাধিক। লোকাল বোর্ডের শিক্ষা-বরাদ্দও শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা উচিত। ঐ ঘোষণার সঙ্গে তিনি উন্নততর পাঠ্যক্রম, শারীর শিক্ষা, প্রকৃতি-পাঠ, পাঠ্যক্রমের সাথে গ্রামীণ প্রয়োজনের সংযোগ, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ইংরাজী পড়ার সূচনা, প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য কৃষি শিক্ষাসহ দুই বৎসরের উন্নত শিক্ষণ, উন্নত বেতন প্রভৃতির কথাও বলেন।

এই নীতির ফলে প্রাথমিক স্তরে সরকারী সাহায্য বাড়ল। স্কুল বাড়ি, সরঞ্জাম ও আসবাবের জন্য বিশেষ বরাদ্দ হল এবং স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশের বদলে অর্ধেকাংশই সরকারী সাহায্যরূপে দেওয়া হল। 'ফলাফলের ভিত্তিতে

সাহায্যের নীতি'ও পরিত্যক্ত হল। ফল হল প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে কার্জন যুগপৎ পরিমাণগত এবং গুণগত উন্নতির নীতিই গ্রহণ করেছিলেন।

কার্জন নীতির মূল্যায়ন ঃ কার্জন নীতির মূল্যায়নের সময় বলতেই হবে যে শিক্ষার মূল আদর্শ কিংবা কাঠামোর কোন মৌলিক সংস্কার তিনি করেননি। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের সাহায্যে গুণগত উৎকর্ষের নীতিতেই তিনি সরকারী উদ্যম ও সাহায্যকে নিয়োজিত করেন। তবে উন্নত পাঠ্যক্রম, মাতৃভাষার গুরুত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিশেষীকরণের দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সংস্কার, শিক্ষা মানের উন্নতি, চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্বও এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে উচ্চতম পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ভিত্তি হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে অধিকতর দায়িত্ব, উন্নত পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ ও শিক্ষক নিয়োগের দিকও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত শিক্ষার সকল দিক ও স্তরেই সরকারী মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়।

আবেগমুক্ত হয়ে বিচার করলে কার্জন আমলে শিক্ষা সংস্কারের বহু দিক প্রশংসার দাবি করতে পারে। শিক্ষার মান এবং পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র্যকরণ, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গবেষণা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন প্রভৃতি অনেক বিষয়েই তিনি এমন বহু কথা বলেছিলেন যা সেই সময় থেকে কার্যকর হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষা সমস্যা এত তীব্র হয়ে উঠত না। বর্তমানে আমরা এমন অনেক কথা বলি যা সেই যুগেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কার্জন বলেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিশ্লেষণে বর্তমানের মানদণ্ডে অতীতের বিচার অসম্ভব। যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই যুগের বিচার। সেই বিচারে তদানীন্তন ভারতীয় যুগমানসের সঙ্গে কার্জনের শিক্ষানীতির হল সংঘর্ষ।

যে পদ্ধতিতে কার্জন তাঁর শিক্ষানীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন তাকে সুস্থ মনে মেনে নেওয়া ছিল জাতীয়তাবাদী ভারতের পক্ষে অসম্ভব। কার্জন চেয়েছিলেন শিক্ষা প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ। তিনি সরকারী অর্থ সাহায্যের সাথে সরকারী নিয়ন্ত্রণকে যুক্ত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করেও তিনি মূলত সরকারী প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বস্তুত উত্তরকালে স্যাডলার কমিশনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বাধিক সরকার-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয় রূপে অভিহিত করেন। সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্ব' স্বীকার করা হল না, অথচ মানোন্নতির নামে বিদ্যালয় 'নিয়ন্ত্রণের' যে নীতি গ্রহণ করা হল, তা বেসরকারী উদ্যোগের পথে বাধা সৃষ্টি করল। পরোক্ষে এ নীতি হল উচ্চ শিক্ষা সংকোচনের নীতি। এ অবস্থাটি জাতির পক্ষে গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব। কার্জনের যুক্তি ছিল—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত 'শিক্ষা প্রসারের জন্য উদারনীতি'র প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল। যথেচ্ছ বেসরকারী উদ্যমের ফলে মানাবনতি ঘটেছে। স্কুলের আবহাওয়ায় রাজনীতি ঢুকেছে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের সরে আসা অনুচিত এবং প্রশাসনের ভারতীয়করণের গতিও মন্থর করা উচিত। সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণের সাহায্যেই মানোন্নয়ন সম্ভব।

অপরদিকে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে তখন নতুন চেতনা। গণশিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথাও ভাবা হচ্ছে। ভারতীয় ভাষা এবং প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি নতুন করে আকর্ষণ বেড়েছে। শিক্ষায় ভাষা মাধ্যমের প্রশ্নটিও নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে। ইতিহাস ও ভূগোলের সাহায্যে দেশপ্রেমের প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রশাসনে দেশীয়করণের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সংক্ষিপ্তাকারে বলা চলে যে ইংরেজ শাসনে

বিরুদ্ধে অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে এবং জাতীয় শিক্ষার প্রতি চেতনা নিবদ্ধ হচ্ছে। শিক্ষা প্রসারকেই আশু প্রয়োজন বলে যখন বিবেচনা করা হয়েছে, তখন শিক্ষা সংকোচনের প্রচেষ্টা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

বস্তুত দক্ষ প্রশাসক হলেও কার্জন ছিলেন গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী। এদেশের ভাবমানসের প্রতি সহানুভূতিহীনতা নিয়ে তিনি শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনা করেছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সিমলা সম্মেলনে দেশীয় শিক্ষাবিদদের তিনি তেমন স্বীকৃতি দেননি। সমাবর্তন ভাষণে তিনি ভারতীয়দের শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করেছেন। সময়ের স্রোতকে অগ্রাহ্য করে প্রশাসনের রথচক্রের সাহায্যে তিনি শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা করেছেন। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির ভাবমানস তখন নরমপন্থার বদলে চরমপন্থার দিকে গতি নিয়েছে। এই পরিবেশে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। সংঘর্ষের ফলশ্রুতিই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলা তথা জাতীয় মেলার সময় থেকেই জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে চেতনা সৃষ্টি হচ্ছিল। একথা ক্রমেই অনুভূত হয় যে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংযোগবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় মূল্যবোধের বিরোধী। সংস্কারের প্রয়োজনও অনুভূত হতে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সমাজসেবী সংস্থা হাণ্টার কমিশন বসবার আগেই প্রচার এবং গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে নেমেছেন। ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের সংস্কারে সন্তুষ্ট না থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন গড়লেন 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ'। কেশবচন্দ্রেরই অনুগামীরা আরও একধাপ এগিয়ে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতার মধ্যে টানাপোড়েনের ফলেই নতুন নতুন সংগঠন জন্ম নিল। মহারাষ্ট্রে স্থাপিত হল প্রার্থনা সমাজ। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম নিল দয়ানন্দের আর্য সমাজ। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হল থিওসফিক্যাল সোসাইটি । ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ত্রুটি ধরা পড়তে দেরী হল না। এই ধরনের ছিটেফোঁটা সংস্কার দিয়ে স্বরাজের আবেগকে বাঁধা গেল না। তেমনই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা সংস্কারও শিক্ষিত ভারতীয়দের খুশি করতে পারল না। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার বছরেই জাতীয় কংগ্রেস শিক্ষা সংস্কারের দাবি তোলে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র গড়লেন 'সারস্বত সমাজ'। প্রতাপ মজুমদার এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হল 'Society for the Higher Training of Youngmen'। (এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে সরকারী অনুমোদন ছিল। স্বভাবতই সরকারী নীতিকে অগ্রাহ্য করে এই প্রতিষ্ঠান তেমন কিছু কাজ করতে পারেনি।)

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের গৌরব পতাকা উড়িয়ে ভারতবাসীর মনে আনলেন জাতীয় গৌরব এবং আত্মপ্রত্যয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের নেতৃত্ব করে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

রাজনৈতিক দিগন্তেও তখন দেখা দিয়েছে নতুন আলো। বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশ সিংহের নাজেহাল অবস্থা, ১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে নবোত্থিত এশিয় শক্তি জাপানের বিস্ময়কর জয়, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব, সমকালেই পারস্যে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান,